International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রকৃতি ও নারী ; একটি দার্শনিক সমীক্ষা

অধ্যাপকঃ দেবেশ মুদি

দর্শন বিভাগ, হুগলী উইমেন্স কলেজ

সারসংক্ষেপঃ

বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্বে নারী ক্ষমতায়নের অবস্থান উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেলেও নারীর সামগ্রিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে আজও প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে। নারীর সমানাধিকার ও ক্ষমতায়নের পক্ষে আজও বিশ্বের কোন না কোন অংশে আন্দোলন সংঘটিত হয়ে চলেছে। তারই সাথে সাথে বিশ্ব উষ্ণায়ন, বৃক্ষ রোপন রোধ, সবুজায়ন তথা প্রকৃতি বিষয়ে বিশ্বের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ আন্দোলন করে চলেছে। নারীর নৈতিক অবমূল্যায়ন ও প্রকৃতির অবমূল্যায়ন আধুনিক যুগে অহরহ সংঘটিত হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত পাশ্চাত্তে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে। নারীর ক্ষমতায়ন, নৈতিক মূল্যায়ন ও সমানাধিকারের লক্ষ্যে নারীবাদীগণ ও প্রকৃতির অবমূল্যায়ন বিরুদ্ধে পরিবেশবাদীগণ পৃথক পৃথকভাবে আন্দোলন ও জন সচেনতার জন্য নিজ নিজ যুক্তি প্রদান করেছেন। পরবর্তীক্ষেত্রে, নারী ও প্রকৃতি উভয়ই নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে, তার নৈতিক অবমূল্যায়ন করা হয়েছে, এ বিষয়ে সোচ্চার হয়ে প্রকৃতি-নারীবাদের আন্দোলন করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃতি-নারীবাদীগণ। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল মারিয়া মাইজ, বন্দনা শিবা, মারে বুকেচিন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রকৃতি-নারীবাদের পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপনের ভিত্তিতে তাঁদের মতবাদকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছেন। এই নিবন্ধে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় হল ভারতীয় দর্শনে বিষেশত বৈদিক যুগ থেকে সাংখ্য দর্শন সম্প্রদায়ে নারী ও প্রকৃতি এর কীরুপ অবস্থান লক্ষ্য করা যেত? যদিও আধুনিক যুগের যেসব চিন্তাবিদ নারী ও প্রকৃতি বিষয়ে যে সমস্যা নিরন্তর আলোচনা ও আন্দোলনের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে, সেই সব সমস্যাগুলি ভারতীয় দর্শনে সরাসরি পাওয়া না গেলেও, গ্রন্থে যেসব ধারনাগুলি পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক ধারনা আমরা পেতে পারি।

কথামুখঃ নারী ক্ষমতায়ন, সমানাধিকার, নৈতিক মূল্যায়ন, প্রকৃতি-নারীবাদ

পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে নারীর সমনাধিকারের লক্ষ্যে যে একটি আদর্শের সূচনা হয়, তা নারীবাদী চিন্তাধারার আকার ধারন করে। এই নারীর অধিকারের আদর্শটি প্রথম আত্ম প্রকাশ পায় ১৭৯২ সালে মেরী উলস্টোনক্র্যাফট তাঁর 'The vindication of the Right of Woman' নামক গ্রন্থে। পরবর্তীক্ষেত্রে আধুনিক নারীবাদী চিন্তাধারার ব্যক্তিগণ এক একটি আদর্শকে কেন্দ্র করে নারীবাদের কয়েকটি ধারার সূচনা করেন । যার মধ্যে বর্তমান কালের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও বহু চর্চিত নারীবাদী যে ধারা, তা হল প্রকৃতি-নারীবাদের ধারনা। নারীবাদী গবেষণার সংযোগ, সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশগত স্বাস্থের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন থেকে Eco-feminism বা প্রকৃতি-নারীবাদ ধারনাটি উদ্ভূত হয়েছে নারীবাদী গবেষণার সংযোগ থেকে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশগত স্বাস্থের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন থেকে,যা লিঙ্গ বৈষম্য, বাস্তুবিদ্যা, জাতি, প্রজাতি এবং রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করা হয় Susan Griffin এর 'Woman and Nature' ও Carolyn Merchant এর 'The Death of Nature(1980)' গ্রন্থের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়(Ecofeminism Revisited p, 02)। প্রকৃতি-নারীবাদ একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর ও প্রকৃতির নৈতিক অবমূল্যায়ন করার বিরুদ্ধে, নারীর নায্য অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রকৃতি-নারীবাদের প্রত্যয়টি ১৯৭৪ সালে Francoised Eubonne ব্যবহার করেন(Feminist thought, p.251)। তিনি তাঁর 'La Feminisme ou La mort' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, নারী নিপীড়নের সাথে প্রকৃতি ধ্বংসের

একটি সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান।[৩] (Ibid. 251) প্রকৃতি-নারীবাদীরা মনে করেন যে, নারী ও প্রকৃতির মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। তার কারণ, নারীরা যেভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অবহেলিত, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, একই রকমভাবে প্রকৃতিকেও মানুষ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছে, ভোগ করেছে ও ধ্বংস করছে। এক্ষেত্রে নারীর নৈতিক মূল্যায়ন যেমন পুরষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা নির্ধারিত হয়, অনুরূপভাবে প্রকৃতির নৈতিক মূল্যায়নও মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। যদিও প্রকৃতির অবমূল্যায়নের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর অবদান নগণ্য। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নারীকে দুর্বল, পরনির্ভর, অনাগ্রাসী, উচ্চাভিলাষীরূপে গ্রহণ করে, একইরকমভাবে প্রকৃতিকেও মাতৃরূপে স্বীকার করে, নারীর বৈশিষ্ট্য আরোপ করে ভোগের আওতায় আনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে Merchant তাঁর 'The Death of Nature(1980)' গ্রন্থে বলেন, সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত নারী প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল, প্রকৃতিকে নারী লালন করত। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি পরিবর্তিত হতে শুরু করে(Ecofeminism Revisited p, 02)।

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিতত্ত্বকে যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সেভাবে ভারতীয় দার্শনিক পদ্ধতিতে প্রকৃতিতত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য বোধগম্য করা খুবই কঠিন। তার কারণ, বিভিন্ন পাশ্চাত্যে ধারনার যথা, নৈসর্গিকবাদী ও ভাববাদী, যান্ত্রিকবাদী ও উদ্দেশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিগুলি পৃথক পৃথক আলোচিত হয়েছে, সেভাবে ভারতীয় দর্শনে আলোচিত হয়নি। পাশ্চাত্যের প্রকৃতিতত্ত্বের ধারনাগুলি ভারতীয় আঙ্গিকে সাদৃশ্যগতভাবে আলোচনা করা হলেও তা পাশ্চাত্যের থেকে উদ্দেশ্যগতভাবে পৃথক বলে মনে হবে। কারণ জড়বাদী চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের পদ্ধতিতে যে চরম বা পরম সত্য অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে সকল দার্শনিক বিষয়গুলি যথা, নৈতিক, তার্কিক, অধিবিদ্যক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচিত হয়েছে, তা পাশ্চাত্যে পাওয়া খুবই কঠিন বলে মনে হয়। জড়বাদী ব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় প্রকৃতিকে নৈতিক সত্তার স্তররূপে , নৈতিক প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত বলে ধারণ করে।

প্রকৃতি ব্যাপকভাবে দুটি অংশ নিয়ে গঠিত যথা স্বতন্ত্র জীব ও তাদের পরিবেশ। জীব গঠিত হয় দেহ ও ইন্দ্রিয় নিয়ে। অপরপক্ষে পরিবেশ সকল আতিরিক্ত জৈব উপাদান নিয়ে গঠিত। প্রকৃতিকে, জৈব অথবা অতিরিক্ত জৈব উপাদানগুলিকে একটি নীতি বা নীতিগুলির দ্বারা পরিচালিতরূপে ধারণ করা হয় যা ব্যক্তির নৈতিক প্রবৃত্তিকে অগ্রগমনে সহয়তা করে ও উন্নীত করে। ব্যক্তি জীব ও পরিবেশ যেখানে সে এই জীবনে নিজেকে সন্ধান করে তা আকস্মিক বা ভাগ্যক্রমে গঠিত নয়। তারা একটি নিয়ম পালন করে যেটিকে কখনও বিশ্বের নৈতিক প্রশাসকের নৈতিক নিয়মরূপে ধারণ করা হয়, আবার নৈব্যক্তিক নিয়মরূপে ধারণ করা হয়, যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রিয়া করে। এই নিয়মটিকে ব্যাপকভাবে নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নীতিরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে। নৈতিক মূল্যের নীতিটি প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত। এই নৈতিক মূল্যের নীতিটি বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন নামে পরিচিত লাভ করে, যেমন ঋত, অদৃষ্ট, কর্ম ও অপূর্ব প্রভৃতি।

প্রাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার প্রেক্ষাপটে নারী ও প্রকৃতির সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে তা আধুনিক যুগে এক অভূতপূর্ব চর্চার বিষয়। ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় নারী ও প্রকৃতিকে কীভাবে দেখা হত? তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ভারতীয় শাস্ত্র ও দর্শনে প্রকৃতি ও নারী অভিন্ন সত্তা হিসেবে বিবেচিত হয়। তার কারণ যে কোনো রাজ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ গড়ে ওঠে প্রাকৃতিক পরিবেশের আধারে। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপন্ন হলে, মানুষের বিপদ সবচেয়ে বেশি। কারন মানুষ যতই সভ্য ও উন্নত হোক, যতই সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে স্বতন্ত্র ও বিছিন্ন হোক, যতই নিজেকে ঈশ্বর মনে করুক, শেষ অবধি প্রকৃতির আনুকূল্য না পেলে তার জীবনও বিপন্ন। বৈদিক যুগের লেখায় দেখা যায় প্রকৃতির সাহচর্যে ও আনুকূল্যে বেড়ে ওঠা মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে যাগযজ্ঞে উপাসনা করেছেন, তাদেরকেই দেবতার আসনে বসিয়েছেন। খরা, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেবতারই অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছেন। জীবন যাপনে সন্তানের মঙ্গল কামনায় তাদেরই আনুকূল্য আশা করেছেন। বৈদিক যুগের সাহিত্যে যেমন বরুন, ইন্দ্র ও মিত্র প্রভৃতি দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বৈদিক দেবী অদিতি, উষা ও সরস্বতী প্রভৃতির ধারনা ও বর্ণনা পাই। বৈদিক যুগে মুনি-ঋষিরা নারী ও প্রকৃতিকে সমমর্যাদায় গন্য করে তাদের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে

তুলেছেন। প্রাচীন বৈদিক যুগে বেশিরভাগ প্রাকৃতিক বিষয়গুলিকে 'জননী' নামে সম্বোধন করা হত। এ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে – 'প্রাহংমৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষম্'(ঋগ্বেদ ১০/১৪৬/৬)' অর্থাৎ যে অরণ্য ফুল দেয়, ফল দেয়, কাঠ দেয়, বেঁচে থাকার রসদ দেয়, তাকে পশুসকলের 'মা' বলে ডেকেছেন ঋষিরা। যে ওষধি অসুস্থ রোগাক্রান্ত জীবের প্রাণ রক্ষা করে, তাকেও 'মায়ের মতো কল্যানী দেবীরূপে প্রশস্তি করেছেন- 'ওষধীরিতি মাতরস্তদ্বো দেবীরূপে ব্রুবে'(ঋগ্বেদ, ১০/৯৭/৪)। প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির সাহচর্যে বেড়ে ওঠা সেযুগের মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রন করতে শেখেনি আজকের মতো। নিজেকে জগতের নিয়ন্তা বলে দাবি করেনি কখনও। মূলত বৃষ্টির ওপরেই নির্ভর ছিল তাদের জীবন। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রকৃতির রুদ্ররূপকে তারা ভয় পেতেন। একারণে প্রকৃতিক যেকোনো বিষয়ের উপর তারা আরোপ করেছিলেন দেবসত্তা। নদীরুপা ও বাকরূপা সরস্বতীর কথা নিরুক্তে বলা হয়েছে। 'অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে'(২/৪১/১৬) এই সরস্বতী একাধারে অন্নদাত্রী ও জ্ঞানদাত্রী। প্রাণের আবেগে ঋষিগণ নানাভাবে তাঁর স্তুতি করেছেন। নদীরুপে তিনি অতি বেগবতী, সমুদ্র গামিনী। তিনি জল ও অন্ন প্রদান করেন। সেই সঙ্গে কর্মে প্রচোদিত করেন, শোভনবুদ্ধির বিকাশ ঘটান (চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্)।

ভারতে মহাশক্তিরূপ বিশ্বমাতার ধারনা ও উপাসনা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। পরমশ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ভারতে শক্তিপূজা গ্রন্থে উল্লেখ করেন; "জগৎ কারণ ঈশ্বরকে জগৎ জননী, জগদম্বা প্রভৃতি নামে অভিহিত করে নারী উপাসনা করা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি। পাশ্চাত্য প্রভৃতি ভারতেতর দেশে ঈশ্বরের পিতৃভাবেরই উপাসনার প্রচলন দেখা যায়।"

ঋগবেদের প্রধানা দেবী অদিতি ও অথর্ববেদের প্রধানা দেবী পৃথিবীদেবী। এই দুই দেবীই পরবর্তী পৌরাণিক যুগে সর্বংসহা-ভবানী ও দুর্গাদেবীতে রুপান্তরিত হয়েছিলেন বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রাণী ও পদার্থ সকলকে ধারণ ও পালন করার জন্যে। পৃথিবীদেবীর অপর নাম ধরিত্রী বা ধরণী। এই দেবী সকল প্রাণী ও পদার্থ সকলকে ধারণ করে। অথর্ববেদে বলা হয়েছে – 'মাতা ভূমিঃ পুত্রা অহম্-পৃথিব্যাঃ' (১২/১/১২)।

ভারতীয় দর্শনে তথা বৈদিক যুগের চিন্তাধারায় বিশ্ব প্রকৃতির শৃঙ্খলা বজায় থাকার জন্যে যে অমোঘ নিয়মের প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়েছে, তা ঋত নামে অভিহিত। ঋত বৈদিক সাহিত্যে একাধারে সত্য, ধর্ম ও পরম তত্ত্বের পরিচায়ক, আবার অপরপক্ষে দিন, রাত্রি ও বিভিন্ন ঋতুর নিয়মিত পরিবর্তন; ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের কর্তব্যতা ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতির নিয়মানুবর্তিতা – এই সকলের সাধারণ নামই ঋত। এই ঋত হল একটি সার্বিক বিশ্বতাত্ত্বিক নিয়ম যা দেবতা, মানুষ, প্রকৃতি, জীব ও জড়ের নিয়ম। এই মৌলনীতি হল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের।

বৌদ্ধ মতবাদে, নারী ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিভিন্নতামুখী এবং সাংস্কৃতিক, তাত্ত্বিক ও সাংকেতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বৌদ্ধ দর্শন স্বীকার করে যে সমস্ত জীব লিঙ্গ ব্যতীত বিদ্যা অর্জনের সুপ্ত প্রবণতা আছে। এই নিয়ম সার্বিকভাবে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে প্রযোয্য। বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থে, প্রকৃতিকে সংসার দশাতে তথা জন্ম,মৃত্যু ও পুনর্জন্মতে উপস্থাপন করা যেতে পারে,কিন্তু সেই সুপ্ত প্রবণতা জাগ্রত অবস্থার জন্য। সমাধি অন্তভূক্ত করে ক্ষণিকত্ব ও প্রতীত্যসমুৎপাদত্বকে বোধগম্য করার সাথে প্রাকৃতিক অবস্থার সম্পর্ককে। কিছু বৌদ্ধ ঐতিহ্যে, নারী ও প্রকৃতিকে জন্মদাত্রী ও পালনকারীরূপে চিহ্নিত করা হয়, তথাপি আসক্তির কারনে সংসারে ক্ষণিক ও অব্যক্তভাবে আবদ্ধও। তারা এর মত বৌদ্ধ নারী যিনি করুনা ও সংরক্ষনকে অঙ্গীভূত করেন, প্রাকৃতিক কল্পনায় চিত্রিত করেন,বিদ্যামূলক গুণগুলিতে নারীত্ব ও প্রকৃতিকে সম্পর্কিত করেন।

সমকালীন আন্দোলনগুলি নারী ও প্রকৃতিকে সমান্তরালভাবে নিপীড়নের চিত্র উপস্থাপিত করেছে এবং বৌদ্ধ দর্শনের নৈতিক মূল্যের যথা করুণা, অহিংসা ও প্রতীত্যপাদ নীতিগুলি লিঙ্গসাম্য ও পরিবেশ বিচারের পক্ষে যুক্তি প্রদান করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ প্রাকৃতিক অবস্থায় অবস্থিত, পরিবেশ শৃংখলা ও নিসঙ্গতায় গুরুত্ব দেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুনীদের প্রাকৃতিক অবস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধতা ও নারী ক্ষমতায়ন উভয়ই ঐতিহাসিকভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় নৈতিকতার আলোচনার ক্ষেত্রে সকল জীবের প্রতি যে দর্শন সম্প্রদায় সংবেদনশীল তা জৈন মতবাদ। জৈন মতবাদে নারী ও প্রকৃতির সম্বন্ধকে সাংকেতিক, ধর্মীয় তত্ত্বগত ও আধুনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জৈন মতবাদে সকল জীবের প্রতি অহিংসাতে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই অহিংসা নীতি প্রকৃতির প্রতি প্রগাঢ় সম্মানকে অন্তর্ভূক্ত করে। পুরুষ ও নারী উভয়কেই এই আদর্শ সমানভাবে ধরে রাখার জন্যে আশা করা হয়। যদিও নারী ঐতিহাসিকভাবে এই ভূমিকায় আবদ্ধ হয়েছে যা যত্নবতী ও লালন পালনে গুরুত্ব দেয়, একই রকম ভূমিকা প্রকৃতির ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। নারীর আদ্ধাত্মিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে জৈন মতাবলম্বীর মধ্যে অর্থাৎ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দিগম্বর সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে নারী ততক্ষণ মোক্ষ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না পুণর্জন্ম গ্রহণ করে পুরুষ হয়। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে নারী সরাসরি মোক্ষলাভে সক্ষম। যদিও জৈন চিন্তাধারায় দেহ ও বাহ্য জগৎ উভয়ই তাৎক্ষণিক ও আসক্তিপূর্ণ। নারীকে প্রায়ই জন্মদাত্রীরুপে ও দেহরুপে চিহ্নিত করা হয়, যা কখনও কখনও সংসারে আরও আবদ্ধরুপে দেখানো হত। একই রকমভাবে প্রকৃতি যে কত সুন্দর দেখানো হত তথাপি অনিত্য ও আবদ্ধ। প্রাকৃতিক জগৎকে জীবে পূর্ণরুপে দেখা যায়, এবং নারী ও প্রকৃতি উভয়কে নৈতিকতা প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়, বিশেষত যখন দুঃখ ও অনুভূতির পক্ষে তাদের ভাগ করা ক্ষমতার সময়। পরিবেশ নীতিবাদ ও নিরামিষবাদী চিন্তাধার ক্ষেত্রে জৈন নীতিতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান সময়ে পরিলক্ষিত।

বৈশেষিক সম্প্রদায় সর্বপ্রথম জগৎ-কে প্রাকৃতিক পথে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করেন। তাদের মতে, প্রাকৃতিক জগৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটি উপাদানে গঠিত। ব্যোম নিত্য, অতীন্দ্রিয় ও বিভু দ্রব্য। অপর চারটি দ্রব্যের নিজস্ব পরমাণু আছে। ওই চতুর্বিধ পরমাণুগুলির সংযোগের ফলে জড়দেহ, প্রাণী ও তার পরিবেশ উদ্ভূত হয়। অদৃষ্টের কারণে প্রথমে পরমাণুর মধ্যে গতি সঞ্চার হয় যা প্রাকৃতিক বস্তুর গঠনকে পরিচালনা করে, যে এ জগতে জন্ম গ্রহণ করে তার উদ্দেশ্যকে পালন করে। এই অদৃষ্ট নীতি ঈশ্বরের মত কোন চেতন সত্তা ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্ম সম্পাদন করতে পারে।

বৈশেষিক সম্প্রদায় স্বতঃ কাঠামো ও মূল্য থাকায় জড় ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে, মানবীয় উদ্দেশ্যের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। এইটি মানব কেন্দ্রিক প্রকৃতি-নারীবাদী আলোচনার সাথে শ্রেণিবদ্ধ করে, যে প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেয় তা শুধুমাত্র মানব ব্যবহৃত একটি উৎস নয়। পরমাণুবাদে জড় জগতের পক্ষে প্রগাঢ় সম্মান নিহিত থাকে, নীতির দ্বারা পরিচালিত, জটিল ও সত্য রুপে দর্শিত। একইভাবে প্রকৃতি নারীবাদ সৎ এর অঙ্গীভূত প্রকৃতিকে অস্বীকার করে, দ্বৈতবাদকে খণ্ডন করে। বৈশেষিক যদিও বিশ্লেষক দেহ-মনের দ্বৈততা নীপিড়নের মূল বলে ঐ দ্বৈততাগুলিকে সমালোচনা করে।

সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি বলতে মূল প্রকৃতিকে বোঝান হয়ে থাকে যা জড় জগতের মূল। এই মূল প্রকৃতি নিত্য ও অচেতন এবং ব্যক্ত জগতের বৈচিত্র ও পরিবর্তনের উৎস। প্রকৃতিকে নারীরুপে প্রকাশ করা হয়। এই মূল প্রকৃতিই ত্রিগুণের তথা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ মাধ্যমে বিশ্বজগৎ-কে ব্যক্ত করে। প্রকৃতি সক্রিয় ও পরিবর্তনশীল অপরপক্ষে পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও অপরিবর্তনীয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে নারীকে সৃজনকারী, মাতৃত্ব ও জন্মদায়িনী শক্তি বলে আভিহিত করা হয়েছে, এইরকম গুনাবলী আমরা প্রকৃতির ক্ষেত্রেও আরোপ করি। সাংখ্য দর্শনে বলা হয় যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফলে জাগতিক সব কিছুর আবির্ভাব হয়েছে। যদিও এখানে পুরুষ বলতে কোন বিশেষ ধরনের মানুষকে চিহ্নিত করা হয়নি।

ভারতীয় প্রাচীন চিন্তাধারায় তথা ভারতীয় দর্শনে নারীর সমানাধীকার ও নৈতিক মূল্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষ্য করা যায় যে নারীর ও প্রকৃতির সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে। তার কারণ, বর্তমান আঙ্গিকে প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরা আলোচনা করার ফলে আধুনিক নারী-প্রকৃতিগত সমস্যা অঙ্কন করা খুবই মুশকিল। তবে এটা দাবী করা যায় যে প্রাচীন যুগে নারী-প্রকৃতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের ভিত পোক্ত হলেও মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় তা তলানিতে এসে পৌছেছিল এবং পরবর্তী কালে নারী-প্রকৃতির চরম শোচনীয় অবস্থায় পৌছায়। এই জন্যই নারী স্বাধীকার ও প্রকৃতি রক্ষার স্বার্থে স্বামীজি, নেতাজি, বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র

১। ঋগবেদ সংহিতা, রমেশ চন্দ্র দত্ত, সদেশ, কলকাতা, ২০০৭

২। প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, সুকুমারী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২২

৩। ভারতীয় দর্শন, প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২

৪। বৈদিক সাহিত্যের রুপরেখা, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০০৩

৫। সংস্কৃত রচনায় প্রতিফলিত পরিবেশ সচেনতা, বিদ্যুৎবরণ ঘোষ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১১

1. Ilaiah, Kancha(1996), Why I Am Not a Hindu: A Sudru Critique of Hindutva Philosophy, Culture and Political Economy, Samay, Calcutta
2. Kinsley, David(1986), Hindu Goddess: Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition, University of California Press, Bervelly
3. Maria, Mies and Vandana, Shiva(1993), Ecofeminism, Femwood Publishing, London & Delhi
4. Vandana, Shiva(1989), Staying Alive: Women, Ecology and Development in India, Kali for Women, London & Delhi